হারিয়ে যাওয়া এক রূপসী বাংলা

দুই বাংলার সমৃদ্ধ বন-জঙ্গল-পরিবেশ এখন প্রায় বিলুপ্ত। ব্রিটিশ আমল থেকে যে ধ্বংসের শুরু, তা এখনও চলছে। সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান। পড়লেন **অরুণাংশু ভট্টাচার্য**

কৃষ্ণেন্দু চাকী

এমন কিছু গ্রন্থ থাকে, যেগুলিকে শুধুমাত্র 'গ্রন্থ'-এর অভিধায় সীমাবদ্ধ রাখলে বিষয়টার প্রতি বেশ অবিচারই করা হয়। শুধু বিষয়ই নয়, এমন অনেক ব্যাপার সে-সবের মধ্যে নিহিত থাকে যে, তাকে সামগ্রিক ভাবে মহাফেজখানা বলাই সঙ্গত। বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী ও গবেষক দেবল দেব প্রণীত 'বিচ্যুত স্বদেশভূমি' এমনই এক বিধুর পরিবেশনামা। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পরিবেশকে এমনই এক প্রাকৃত অবস্থানে দেখতে চান, এমনই এক উপপ্রবহীন চরাচরের সন্ধান করতে চান, যা এক কথায় নিশ্চিত ভাবে দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য। পক্ষান্তরে তা রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের কাছে সম্পূর্ণই অস্বস্তিকর একটি বিষয়। এমনকী, সাধারণ মানুষও যে দেবলের উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন, কিংবা অজ্ঞতাবশত উপেক্ষা করেছেন, তার করুণ উদাহরণ গ্রন্থমধ্যে রয়েছে। রয়েছে আদিবাসী জনমানুষকে উৎখাত ও অত্যাচার করে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠিত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার নির্মম ইতিহাস।

গ্রন্থের নামকরণে 'স্বদেশভূমি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়সমূহ প্রধানত দুই বাংলা ও বাংলার বন-জঙ্গল-পরিবেশকে কেন্দ্র করেই। কেন না, গ্রন্থনামের পাশাপাশি 'বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান' বলতে যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে, তা একান্ত ভাবে বাংলাকে ঘিরে।

এই জাতীয় একটি গ্রন্থের উদ্দেশ্য কী— এটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। লেখক দেবল দেব তা অনুমান করেছিলেন। সম্ভবত সে কারণেই মুখবন্ধে তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন। 'রূপসী বাংলা' মানে যা বোঝায়, তা আক্ষরিক অর্থেই এক কালে সত্য ছিল। তাঁর কথায়, 'সব কিছু দিয়েছে সে আমাদের। ... সন্ততিরা কী দিয়েছে ওকে। 'কিছু না, কিছু না'। মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে'... আর এই ভানের পরিমাণ বেড়েই চলেছে বছরের পর বছর— এক মহাপরবের যাপনে।... তার নাম 'আধুনিকতা'।... এই পরবের উপচার আর ইন্ধন সংগ্রহ করতে, ওই রূপসীর সোনার কলস ক্রমে খালি হয়েগিয়েছে। তবে ঐ কলসির আয়তন তো কম নয়, তাই এখনও তলানিতে কিছু যেন পড়ে আছে।... তার কিছু কিছু রত্নাবশেষ আমার চোখে পড়েছে। সেগুলোকে বের করে খানিকটা দেমাক করে সবাইকে দেখাবার প্রয়াস আমার এই বই।'

গ্রন্থমধ্যে দেবল যে বিষয়গুলির ব্যাখ্যাকরতে চেয়েছেন, তা এ রকম— 'অন্ন কৃষ্টি, অন্য কৃষ্টি', 'বাংলার জংলি খাবার', 'দাও ফিরে সে অরণ্য: নেবে কে?', 'বাংলার লুপ্তপ্রায় গাছপালা', 'ধানের জঙ্গল ও ঠাকুরপুকুর', 'যুধিষ্ঠির উবাচ'।

'অন্ন কৃষ্টি, অন্য কৃষ্টি' বিভাগে ধানের প্রায় অজানা ইতিহাস বর্ণনা থেকে শুরু করে বাংলায় কত রকমের ধান ছিল, কতগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে, তার কারণই বা কী, ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাবেকি ধানের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহে এসেছিল ৩৯৬টি ধানের জাত। ২০০৫ সালে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ৪১৭, ২০১২ সালে ৫২৬। এর মধ্যে ৮০টি সাবেকি ধানের জাত বিলুপ্ত, চাষিরা আর সে সব চাষ করেন না। বাকিগুলোও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। এ সব কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল, কেন দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের খাদ্যসুরক্ষা হারিয়ে গেল, তার কারণও জানিয়েছেন তিনি। যেমন সীতাভোগ ধান বর্ধমান জেলায় বিলুপ্ত। দেবলের প্রতিষ্ঠিত 'বসুধা' ট্রাস্টের ব্রীহি বীজ বিনিময় কেন্দ্র থেকে যে সব চাষিদের বীজ বিতরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে এখন শুধুমাত্র একজনই এই ধানের চাষ করেন। এই ধানের চাল দিয়েই এককালে সীতাভোগ তৈরি হত। আজ সে সুগন্ধি চালও নেই। সীতাভোগও আর অনবদ্য নয়। ধান ও চাল সম্পর্কে তিনি এ রকম অজস্র তথ্য দিয়েছেন, একাধিক সারণির সাহায্যেও তা বিস্তারিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি 'বাংলার জংলি খাবার'। তাঁর মতে দশ হাজার বছর আগে কৃষির উদ্ভাবন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রায় চার লক্ষ বছর আগে মানুষ খাদ্য আহরণ করতেন শিকার করে, মাছ ধরে, বন্য ফলমূলকন্দ সংগ্রহ করে। ওই সব অ-কৃষিজ খাদ্যের মধ্যে যে গুণ বা পুষ্টি থাকত, তাতেই আদিবাসী জনসম্প্রদায় সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে থাকত। বাংলাতেও এক সময়ে এই জাতীয় অজস্র খাদ্যের সম্ভার ছিল, যা নানা প্রাকৃতিক ও মানুষিক কারণে প্রায়বিলুপ্ত। তবুও এখনও হাতে-গোনা দু-একটি জায়গায় যে সব মানুষ এই খাদ্যের উপরনির্ভরশীল, তাঁরা হলেন মেদিনীপুরের লোধা ও শ্রু এবং পুরুলিয়ার শবর সম্প্রদায়। তার মধ্যে গেঁড়ি, গুগলি, কাঁকড়া, বনের ফলমূল, নানা ধরনের কন্দ, ছত্রাক বা চাতুই ইত্যাদিই প্রধান। এই সব খাদ্যের মধ্যে যে পুষ্টিগুণ রয়েছে, একাধিক সারণি দিয়ে লেখক তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

পরের অধ্যায় 'দাও ফিরে সে অরণ্য: নেবে কে?'। সেখানে লেখক বলতে চেয়েছেন, দেশের বন সংরক্ষণের আধুনিক যে ইতিহাস, তা বনের মূল ঐতিহ্যকে নষ্ট করে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করে নেওয়ার কাহিনি। পুরনো বনবাসী সমাজগুলির আর্থনীতিক ভিত্তিকে চুরমার করে দেওয়ার ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনীতির মর্মন্তুদ ইতিহাস। ভারতে ইংরেজ শাসনের অনেকগুলি পদ্ধতির মধ্যে একটি ধারণা ছিল, বনগুলি সাম্রাজ্যের উন্নয়নের পথে বাধা। কাজেই জঙ্গল নষ্ট করে কৃষিজমি তৈরি করতে হবে। এ জন্য ১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয় 'বাজে জমিন দফতর'। রেলপথের স্লিপার তৈরির জন্য লক্ষ লক্ষ শালগাছ নির্বিচারে কাটা হয়। ১৮৬৪ সালে বন দফতর প্রতিষ্ঠা হয়, তার পরের বছর বিষয়টিকে আইনি করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় বন আইন। যার ফলে কিছু কিছু ধানের জঙ্গল বাদে বাংলার সমস্ত জঙ্গল রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত হয়ে গেল। এই ধারণার সৃষ্টি করাহল শিকারজীবী ও অ-কৃষিজীবীরা অসভ্য ও বর্বর। ফলে তাদের উপর শুরু হল অত্যাচার। উচ্ছিন্ন হতে হল তাদের। তা সত্ত্বেও যাঁরা নিজেদের জঙ্গলসত্তা পরিত্যাগ করতে পারলেন না, তাঁদের আখ্যা দেওয়া হল 'জন্মগত অপরাধী' বলে। এই ভাবে বন ও আদিবাসীদের ধ্বংসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বনের অতিপ্রাচীন সংস্কৃতিরও বিলুপ্তি ঘটতে লাগল। তার উপর অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশক্রমে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল ইউক্যালিপটাস এবং অ্যাকাসিয়া বা আকাশমণি গাছ। এর জঙ্গল সৃষ্টি করে বনাঞ্চলের অবশিষ্ট গাছগাছালি ও পোকামাকড় মেরে ফেলা হল। ফলে বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে এখনও যাঁরা বনবাসী তাঁরা প্রাচীন গাছ দেখতেই পান না, চেনেনও না। লেখক এই প্রসঙ্গে 'রোহিন' গাছের উদাহরণ দিয়েছেন। সাঁওতালদের রোহিন পরবে রোহিন গাছ যে লাগত, তা এখনকার লোকজন জানেন না। 'রোহিন' নামটাই অজানা।

বাংলার বহু গাছ যে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার তালিকা ও কারণসমূহ লেখক এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। 'বাংলার লুপ্তপ্রায় গাছপালা' অধ্যায়ে মাত্র দু'টি গাছ সম্পর্কে বিশদে বলেছেন লেখক। ভাদু এবং সীতাপত্র। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং লেখকও প্রথমে এই গাছ দু'টি চিনতে পারেন নি। ১৯৯৭ সালে বাঁকুড়ার ছান্দারে একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া ধানের জঙ্গলের কাছে অচেনা একটি গাছ দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ গাছটাকে তিনি চেনেন না, কাউকে নাম জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারলেন না। তবে স্থানীয় একজন গাছটির নাম বলেছিলেন ভাদু। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে রয়্যাল বটানিক গার্ডেনে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গিয়ে তিনি গাছটির পরিচয় জানতে পারেন। মোট ১০হাজার ৫০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল ঘুরে তিনি নিশ্চিত, গোটা পূর্ব ভারতে এই গাছটির জুড়ি নেই একমাত্র বাঁকুড়ার ছন্দারের গাছটি ছাড়া। বারো বছর ধরে তিনি গাছটির বীজ থেকে চারা তৈরি করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত টিস্যু কালচার করে তার চারটি চারা কোনও রকমে তৈরি করেন। এ দিকে বাঁকুড়ার গাছটিকে রক্ষা করার জন্য লেখক বহু চেষ্টা করলেও গ্রামবাসীরা এক সময় গাছটি কেটে দেন। এ রকমই আর একটি গাছ 'সীতাপত্র'। এই দুর্লভতম গাছটির বিশেষত্ব এই, তার পাতার উপর আঁচড় কাটলে তা লেখার মতো ফুটে ওঠে। নানা প্রক্রিয়ার পর এর পাঁচটি গাছ বেঁচে আছে বাঁকুড়ার জঙ্গলে।

পরের অধ্যায় 'ধানের জঙ্গল ঠাকুরপুকুর' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক জানাচ্ছেন, ভারতের প্রাচীনতম ধানের জঙ্গলগুলির বয়স সিন্ধু সভ্যতার সমান। এক সময় বাংলায় অনেক ধানের জঙ্গল ছিল। থান অর্থে এমন কিছু বিরাট জঙ্গল এলাকা যেখানে গাছ কাটা, শিকার করা, জলাশয় থেকে জল নেওয়া নিষিদ্ধ। আদিম মানুষ লক্ষ করেছিল, অবাধ শিকার আর জঙ্গল ধ্বংসে প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খাদ্যের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এই 'আরক্ষণী' চেতনা ক্রমশ বিভিন্ন বৃক্ষদেবতা বা প্রকৃতিপুজোয় রূপ নেয়। ফলে গাছ কাটা পাপ— এই বোধ তাঁদের মধ্যে গভীর বিশ্বাসে পরিণতহয়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে থানগুলি হিন্দু ঠাকুরের থানে পরিণত হয়। এই সংস্কৃতায়নের ফলে প্রকৃতিপুজোর ধারণা অপসৃত হয়ে তা প্রধানত নানা দেবদেবীর পুজোআচ্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেগুলি আর পবিত্র বনাঞ্চল থাকে না। থানের গাছপালা নষ্ট হলে জঙ্গলের উৎসই যে শেষ হয়ে যায়, এ কথা বাংলার চাষিরা তো বটেই, বনদফতরও জানে না। যেমন লেখক বলছেন— বাংলার চাষিরা জানেন না, গ্রামের একটা থানের জঙ্গল থাকার পুণ্যে তাঁদের ফসলের কতটা অংশ শতরু পোকার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। টের পান না, ওই থানের জাঙ্গল থাকার জন্যই তাঁদের সবজি আর ফলের বাগানে পরাগ সংযোগের কাজটা করে গেল মৌমাছি আর প্রজাপতিরা। থানের জঙ্গল কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত টিটাগড়ের 'বড়াম থান'। নামেই বোঝা যায় এটি সম্ভবত সাঁওতালদের থান ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে ওই থানটির নাম হয়ে গেল ব্রহ্মস্থান। পরবর্তিকালে বাস কন্ডাক্টরদের মুখে জায়গাটি পরিচিত হয়ে গেল বড়া মস্তান নামে। জঙ্গল তো কবেই নিশ্চিহ্ন! থানের পুকুরগুলিও এক সময়ে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। বাংলার এ রকম বেশ কিছু পুকুরের উল্লেখ করেছেন লেখক। কিন্তু জঙ্গলের যে পরিণতি, পুকুরগুলোরও একই পরিণতি হয়েছে। উন্নয়নের জোয়ারে 'ওই সব প্রাচীন কুসংস্কার'কে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন দীপঙ্কর সেনগুপ্তের ভূমিকা। গ্রন্থ পরিকল্পনা ও রূপায়ণে অত্যন্ত সুরুচি ও মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সৌরীশ মিত্রের প্রচ্ছদ অনবদ্য।

> অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশে নিয়ে আসা হয়েছিল ইউক্যালিপটাস এবং অ্যাকাসিয়া গাছ। এর জঙ্গল সৃষ্টি করে বনাঞ্চলের অবশিষ্ট গাছগাছালি মেরে ফেলা হল।

বিচ্যুত স্বদেশভূমি
দেবল দেব। ধ্যানবিন্দু ও বসুধা। ৫৫০ টাকা

Copyright - 2020 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights : Times Syndication Service.